ইউনিট ১
ফসল সংরক্ষণ ও পোকার দেহের পরিচিতি

ইউনিট ১ ফসল সংরক্ষণ ও পোকার দেহের পরিচিতি

বাংলাদেশের আবহাওয়া ফসল উৎপাদনের জন্য যেমন উপযোগী তেমনি ফসলের ক্ষতিকর পোকা-মাকড়, ইঁদুর, রোগবালাই, আগাছা ইত্যাদির বংশবৃদ্ধির জন্যও সহায়ক। এসব ক্ষতিকর প্রাণী ও উদ্ভিদকে আপদ বলা হয়। এসব আপদ কর্তৃক ফসলের প্রভূত ক্ষতিসাধিত হয়ে থাকে। এক জরিপে দেখা গেছে যে, এদেশে প্রায় ৬০০ ধরনের পোকা মাকড় ফসলের ক্ষতিসাধন করে থাকে। এছাড়া পোকা মাকড় ও বিভিন্ন আপদ দ্বারা গোলাজাত শস্যও শতকরা প্রায় ৫-৮ ভাগ প্রতি বছর বিনষ্ট হচ্ছে। এক সূত্রে জানা গেছে যে, কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য আপদ দ্বারা ফসলের যে পরিমাণ ক্ষতিসাধিত হয় তা রোধ করতে পারলে বিদেশ থেকে আর খাদ্যশস্য আমদানি করতে হতো না। সুতরাং ফসল সংরক্ষণের জন্য পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে পোকার দেহের পরিচিতি জানা আবশ্যক। কারণ দমন পদ্ধতি সব পোকার জন্য একরকম নয়।

এই ইউনিট পাঠ করলে আপনি ফসল সংরক্ষণ সম্পর্কে ধারণা, কৃষিতে পোকা মাকড়ের গুরুত্ব, পোকার দেহের বিভিন্ন অংশের পরিচিতি, পোকার বিভিন্ন মুখাবয়ব ও তাদের বিবরণ, পোকার বিভিন্ন প্রকার পাখা, পা ও শুঙ্গ এবং তাদের বিবরণ দিতে পারবেন।

পাঠ ১.১ ফসল সংরক্ষণ সম্পর্কে ধারণা

এ পাঠ শেষে আপনি–

- শস্য সংরক্ষণের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- ফসলের বিভিন্ন আপদের নাম উল্লেখ করতে পারবেন।
- কোন্ আপদ দ্বারা ফসলের কী পরিমাণ ক্ষতি হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

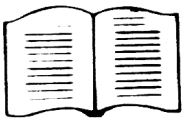

বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। শতকরা ৬৩ ভাগ লোক বিভিন্ন প্রকার ফসলের চাষাবাদ করে থাকে। এ দেশের বিরাজমান আবহাওয়া ফসল উৎপাদনের জন্য যেমন সহায়ক তেমনি বিভিন্ন প্রকার আপদের জন্যও অনুকূল প্রভাব ফেলে থাকে। এই ক্ষতিকর আপদ অর্থাৎ পোকা মাকড়, রোগবালাই, আগাছা, ইঁদুর, শিয়াল, পাখি প্রভৃতির আক্রমণজনিত ক্ষয়ক্ষতি থেকে ফসল রক্ষা করা এবং তাদের বংশবিস্তারে বাধা প্রদান করাকে শস্য সংরক্ষণ বলা হয়। ব্যাপক অর্থে ফসলকে ক্ষেত খামারে ও গুদামে উল্লেখিত আপদের হাত থেকে রক্ষা করাই হলো শস্য সংরক্ষণ।

ফসলকে ক্ষেত খামারে ও গুদামে আপদের হাত থেকে রক্ষা করাই হলো শস্য সংরক্ষণ।

কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ও অনেক কষ্টে উপার্জিত টাকা পয়সা খরচ করে তার জমিতে ফসল উৎপাদন করে। অথচ ক্ষতিকর পোকা মাকড় অল্প সময়ের মধ্যেই সে ফসল নষ্ট করে দিতে পারে। এমতাবস্থায় কৃষকের দুঃখের কোনো সীমা থাকে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ধানের শীষকাটা লেদা পোকার আক্রমণ ব্যাপক হলে শতকরা ৮০ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত ধানের শীষ নষ্ট হয়ে থাকে। জরিপে দেখা গেছে যে, পোকার আক্রমণে প্রতি বছর দেশে গড়ে শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ পর্যন্ত ফসল মাঠেই নষ্ট হয়।

কীটপতঙ্গের আক্রমণে যে শুধু মাঠ ফসলই নষ্ট হয় তা নয়। খাদ্য ও বীজ হিসেবে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত গোলজাত শস্যও কীটপতঙ্গ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে। প্রতি বছর শতকরা প্রায় ৫ থেকে ৮ ভাগ পর্যন্ত গোলাজাত খাদ্যশস্য কীটপতঙ্গ দ্বারা নষ্ট হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, শুধু সরকারী গুদামেই প্রতি বছর পোকার আক্রমণে এক লক্ষ টন খাদ্যশস্য নষ্ট হয়। এতে যে বিরাট ধরনের একটা ক্ষতি হচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পোকা-মাকড়ের মতো রোগ-বালাইও আমাদের দেশে শস্যের ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। শস্যের রোগ সম্পর্কিত পর্যাপ্ত গবেষণা আমাদের দেশে হয়নি। দেশের বিরাজমান আবহাওয়ায় ফসলের রোগ জীবানু যেমন- ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, কৃমি, মাইকোপ্লাজমা প্রভৃতির বেঁচে থাকা ও বংশ বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত সহায়ক। ফলে এদেশে প্রায়

প্রত্যেক ফসলে রোগ বালাই এর প্রাদুর্ভার অত্যন্ত ব্যাপক। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে ১৬২ প্রকারের আবাদি ফসলে (বনজ বৃক্ষসহ) ৬৮২ টি রোগের আক্রমণ হয় বলে জানা গেছে এবং এর মধ্যে ২৯১ টি রোগকে প্রধান ও শস্যহানির মারাত্নক কারণ হিসেবে মনে করা হয়। এসব রোগের আক্রমণে প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রায় ৭২০ কোটি টাকার ফসল (বনজ বৃক্ষসহ) নষ্ট হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এ হিসেব অত্যন্ত সংকীর্ণভাবে করা হয়েছে। প্রকৃত হিসেবে এর পরিমাণ আরও বেশি হবে।

পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই দ্বারা যেমন শস্যহানি ঘটে, আগাছাও তেমনি শস্যের ফলন ও গুনগতমান কমিয়ে দেয়। ফসলের ক্ষেতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সকল উপকরণ সরবরাহ করা সত্ত্বেও শুধুমাত্র আগাছা ফসলের উৎপাদন শতকরা ৩০ ভাগ কমিয়ে দেয়। কারণ আগাছা মাটি থেকে পুষ্টি উপাদান নেয়া ছাড়াও অন্যান্য কার্যাবলীতে ফসলের সাথে প্রতিযোগিতা করে থাকে। তাছাড়া আগাছা সেচের পানি ও রাসায়নিক সারের কার্যকারিতা শতকরা ২০-৩০ ভাগ কমিয়ে দেয় এবং কীটপতঙ্গ দমনের ব্যয়েও শতকরা ১০-৩০ ভাগ বাড়িয়ে দেয়।

কীটপতঙ্গের চেয়ে আকারে বড় যে সমস্ত মেরুদন্ডী প্রাণী ফসল বা ফসল জাত এবং অন্যান্য জিনিষের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে থাকে তাদেরকে অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণী বলে।

কীটপতঙ্গের চেয়ে আকারে বড় যে সমস্ত মেরুদন্ডী প্রাণী ফসল বা ফসল জাত এবং অন্যান্য জিনিষের প্রভূত ক্ষতিসাধন বা অনিষ্ট করে থাকে, তাদেরকে অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণী বা মেরুদন্ডী আপদ বলে। যেমন - ইঁদুর, শিয়াল, সজারু, কাঠবিড়ালী, পাখি প্রভৃতি। ইঁদুর হলো ফসলের একটি বিশেষ শত্রু। প্রতি বছর ইঁদুর মাঠ ও গুদামজাত শস্যের প্রচুর ক্ষতি করে থাকে। এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, ইঁদুর মাঠের গমের শতকরা প্রায় ১২ ভাগ ক্ষতি করে থাকে যার পরিমাণ প্রায় ৭৭ হাজার টন। সাধারণ হিসেবে দেখা গেছে যে, দুই একর জমিওয়ালা একজন কৃষকের মাঠে ৩০০ টাকা এবং ঘরে ১০০ টাকার ফসল ইঁদুর বিনষ্ট করে থাকে। ইঁদুর প্রতি বছর আমাদের দেশে ৩০০ থেকে ৪৮০ কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট করে। বাংলাদেশে ইঁদুর জাতীয় প্রাণী দ্বারা প্রতিবছর ন্যূনতম পক্ষে ১০ লক্ষ টন গম, ১১০ লক্ষ টন রোপা আমন ও ২০ লক্ষ টন জলি আমন ধান ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ইঁদুর দ্বারা ক্ষতির নমুনা নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো–

১. ইঁদুর জাতীয় প্রাণী গুদামজাত শস্য যেমন–চাল, ডাল, গম এবং মাঠশস্য যেমন– ধান, গম, আনারস, আখ, নারিকেল ইত্যাদির ক্ষতিসাধন করে থাকে।

২. এরা মানুষের খাদ্যে ভাগ বসায় এবং তার অপচয় ঘটায়। এদের মলম ত্র দ্বারা খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয় এবং তা মানুষের ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

৩. এরা কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র, ব্যাগ, বৈদ্যুতিক তার ইত্যাদি কেটে নষ্ট করে।

৪. ইঁদুর মানুষের জন্য বহু মারাত্নক রোগ যেমন– প্লেগ রোগের জীবানু বহন করে এবং তার সংক্রমণ ঘটায়।

৫. ইঁদুরের কিছু কিছু প্রজাতি মাটিতে গর্ত খোঁড়ায় অত্যন্ত পটু। এজন্য বহু বাঁধ, বেড়ী বাঁধ, আইল, পুল ইত্যাদি অকালে ধ্বংস হয়।

প্রতিবছর শিয়াল প্রায় ৪৮৩ কোটি টাকার ফসল ও গৃহপালিত জীবজন্তু নষ্ট করছে।

শিয়ালও ফসলের ক্ষতি করে থাকে। শিয়াল আখ, ভূট্টা, চীনাবাদাম, তরমুজ, বাঙ্গী, কাঁঠাল, আনারস ইত্যাদি ফসলসহ হাঁস-মুরগী, গরু, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদির বাচ্চার ক্ষতিসাধন করে। শিয়াল আখ ফসলের জন্য একটা মারাত্নক অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণী। এর দ্বারা প্রতি বছর এদেশে প্রায় ১০-২৪% আখ ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এক জরিপে দেখা গেছে যে, প্রতিবছর শিয়াল প্রায় ৪৮৩ কোটি টাকার ফসল ও গৃহপালিত জীবজন্তু নষ্ট করছে। শিয়াল মানুষের জন্যও যথেষ্ট ক্ষতিকর। এর কামড়ের ফলে রেবিস, টিটেনাস প্রভৃতি রোগ হয় এবং লেপ্টোস্পাইরোসিসসহ অনেক ধরনের রোগজীবানু ছড়ায়।

খরগোস দ্বারাও অনেক শস্য বা ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এরা বাঙ্গী, তরমুজ ইত্যাদির পাতা খায়, গোলআলু খায় এমনকি আনারসেরও ক্ষতিসাধন করে থাকে।

কাঠবিড়ালী সাধারণত বিভিন্ন ফল খেয়ে এবং কেটে তার ক্ষতিসাধন করে থাকে। এছাড়া এরা বিভিন্ন গাছে যেমন– নারিকেল গাছে গর্ত বা ফোঁকর তৈরি করে সেখানে বসবাস করে। এর ফলে গাছ যথেষ্ট ক্ষতির সন্মুখীন হয়।

ক্ষতিকর মেরুদন্ডী প্রাণীদের মধ্যে পাখীও ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে। যেমন- কাক, টিয়া, ময়না, শালিক, চড়ুই, কবুতর, বাবুই প্রভৃতি। মাঠে বীজ বপণ করার পর পাখি বীজগুলো খেয়ে ফেলে বা চারা গজালে চারা উপড়ে ফেলে। যেমন- গমবীজ লাগানোর পর সে ক্ষেতে শালিক ও চড়ুইয়ের উপদ্রব বেড়ে যায়। পাকা ধানে টিয়া, বাবুই পাখি এবং পাকা মরিচ ও টমেটোতে টিয়া প্রধান অনিষ্টকারী পাখি। গুদামজাত করার জন্য যখন ফসল শুকানো হয় তখন তা বিভিন্ন প্রকার পাখি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যেমন- ধান শুকানোর সময় মাঠে বা উঠানে শালিক, কবুতর, চড়ুই, কাক প্রভৃতি পাখির উপদ্রব বেড়ে যায়।

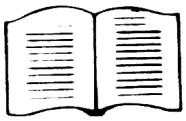

সারমর্ম ঃ বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষক কষ্ট করে যে ফসল উৎপাদন করে তা মাঠে ও গুদামে বিভিন্ন প্রকার আপদ দ্বারা নষ্ট হয়ে থাকে। যেমন– কীটপতঙ্গ, রোগ-বালাই, আগাছা, ইঁদুর, শিয়াল, পাখি প্রভৃতি আপদ। ফসলকে এসব আপদের হাত থেকে রক্ষা করাই হল শস্য সংরক্ষণ। প্রতি বছর এসব আপদ দ্বারা ফসলের প্রচুর পরিমাণ ক্ষতিসাধিত হচ্ছে। টাকার হিসেবে তা এক বিরাট অংকে গিয়ে দাঁড়াবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এক তথ্যে জানা গেছে যে, এসব আপদ দ্বারা ফসলের যে পরিমাণ ক্ষতিসাধন হচ্ছে তা রোধ করতে পারলে বিদেশ থেকে আর খাদ্যশস্য আমদানি করতে হতো না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

ক. বাংলাদেশে প্রায় কত ধরনের পোকা-মাকড় ফসলের ক্ষতিসাধন করে থাকে?

i) ৪০০ ii) ৫০০
iii) ৬০০ রা) ৭০০

খ. রোগের আক্রমণে প্রতি বছর এদেশে কত কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়?

i) ১০০০ কোটি টাকার ii) ৭২০ কোটি টাকার
iii) ৯০০ কোটি টাকার iv) ২০০০ কোটি টাকার

২। সত্য হলে ''স'' এবং মিথ্যা হলে ''মি'' লিখুন।

ক. পাখী অমেরুদন্ডী প্রাণী।
খ. শিয়ালের কামড়ে রেবিস রোগ হয়।

৩। শুন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. ইঁদুর ---------- রোগের জীবানু বহন করে।
খ. ধানের শীষ কাটা লেদা পোকার আক্রমণ ব্যাপক হলে শতকরা --------- ভাগ ধানের শীষ নষ্ট হয়।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. দুইটি মেরুদন্ডী আপদের নাম লিখুন?
খ. পোকার আক্রমনে প্রতি বছর শতকরা কতভাগ ফসল মাঠেই নষ্ট হয়?

পাঠ ১.২ কৃষিতে কীটপতঙ্গের গুরুত্ব

এ পাঠ শেষে আপনি–

- কীটপতঙ্গের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কীটপতঙ্গের উপকারী প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

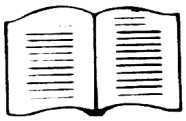

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এ দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক কৃষির উপর সরাসরি নির্ভরশীল। কৃষি বলতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ফসল উৎপাদনকেই বুঝানো হয়ে থাকে। আর এ উৎপাদন আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। কৃষিক্ষেত্রে আদিকাল থেকেই মানুষ কীটপতঙ্গের সাথে সংগ্রাম করে আসছে। তবুও এর সাথে কুলিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। নানা রকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এরা টিকে যাচ্ছে এবং এদের বংশকে বাড়িয়েই চলছে। কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মূখ্য কীটপতঙ্গ ধ্বংস হলেও পরবর্তীতে গৌণ পোকাই আবার মূখ্য পোকা হিসেবে আক্রমণ করে থাকে। আবার অনেক সময় কীটনাশকের মাত্রা কম হওয়াতে পোকাগুলো ঐ কীটনাশকের প্রতি প্রতিরোধী হয়ে উঠে। যার ফলে পরবর্তীতে ঐ কীটনাশক জমিতে বেশি মাত্রায় প্রয়োগ করলেও কোনো ফল পাওয়া যায় না, বরং উপকারী পোকা মাকড় ধ্বংস হয়ে কৃষি ক্ষেত্রে ক্ষতিকর পোকামাকড়ের সংখ্যা বেড়েই চলে। এরা প্রায় সব রকমের গাছপালা, লতা-গুল্ম, এমনকি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উদ্ভিদ প্রজাতিকেও আক্রমণ করে থাকে। মাঠ পর্যায়ের উৎপাদিত খাদ্যশস্য যেমন– ধান, গম, পাট, শাক-সবজি, মসলা, ফল-মূল ও অর্থকরী ফসল যেমন- পাট, চা, তুলা, বনজ সম্পদ থেকে শুরু করে গুদামজাত খাদ্যশস্য পর্যন্ত এরা আক্রমণ করে থাকে এবং প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। এক জরিপে দেখা গেছে যে, কেবল ধান ফসলেই ১৫৯ টির অধিক প্রজাতির পোকা ক্ষতিসাধন করে যার মধ্যে ২০-২৩ টি প্রজাতির পোকা অধিক ক্ষতিকর। এ পোকাগুলো আউশ মৌসুমে শতকরা ২৪ ভাগ, আমন মৌসুমে শতকরা ১৮ ভাগ এবং বোরো মৌসুমে শতকরা ১৩ ভাগ ধানের ক্ষতি করে থাকে। কীটপতঙ্গ উৎপাদিত খাদ্যশস্যের যে পরিমাণ ক্ষতি করে থাকে তা বিদেশ থেকে আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের প্রায় দ্বিগুন বলে জানা গেছে। এদের আক্রমণ চরমে পৌঁছলে ৮০-১০০ ভাগ পর্যন্ত ফসলের ক্ষতি হয়ে থাকে। এদেশে বিরাজমান আবহাওয়া ফসল উৎপাদনের জন্য যেমন সহায়ক তেমনি অনিষ্টকারী পোকা মাকড়, রোগ বালাই, ইঁদুর প্রভৃতির বংশবৃদ্ধির জন্যও সহায়ক। মানুষ কর্তৃক প্রয়োগকৃত যে কোনো দমন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এরা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে এবং প্রতিকূল পরিবেশেও বেঁচে থাকতে পারে। প্রতিকূল পরিবেশে এরা অপছন্দনীয় খাবার খেয়েও জীবন ধারণ করতে পারে। পোকা মাকড় যেভাবে ফসলের ক্ষতি করে তা নিম্নে সংক্ষপে আলোচনা করা হল–

কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মূখ্য কীটপতঙ্গ ধ্বংস হলেও পরবর্তীতে গৌণ পোকাই আবার মূখ্য পোকা হিসেবে আক্রমণ করে থাকে।

১. চর্বনোপযোগী মুখোপাঙ্গ বিশিষ্ট পোকা গাছের পাতা, কুঁড়ি, কান্ড, ছাল ও ফল চিবিয়ে খেয়ে ফসলের ক্ষতি করে। যেমন– ঘাস ফড়িং, পামরী পোকা, ক্যাটারপিলার পর্যায়, পঙ্গপাল ইত্যাদি।

২. অনুবিদ্ধন ও শোষনোপযোগী মুখোপাঙ্গ বিশিষ্ট পোকা পাতা, কুড়ি, কান্ড ও ফল থেকে রস শোষণ করে নিয়ে ফসলের ক্ষতি করে থাকে। যেমন– জাবপোকা এভাবে সীম, সরিষা ফসলের ক্ষতিসাধন করে।

৩. কিছু বিটল আছে যারা কাঠ ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে ও কাঠের প্রভ ত ক্ষতি করে। যেমন– কাঠ ছিদ্রকারী বিটল।

৪. অনেক পোকার আক্রমণে গাছের কান্ডে ও পাতায় ফোসকার মত অবস্থার (Cancerour growth) সৃষ্টি হয়। যেমন– ধানের গল (Rice gall)।

৫. মাটিতে বসবাসকারী কিছু পোকা আছে যারা গাছের শিকড় এবং নিচের কান্ড কেটে দিয়ে বা খেয়ে মারাত্মক ক্ষতি করে। যেমন– কাটুই পোকা (Cutworm) দিনের বেলা লুকিয়ে থাকে, কিন্তু

সন্ধ্যা হলেই আলু গাছের শিকড় কেটে দেয়; উঁই পোকা (Termite) ও হোয়াইট গ্রাব (white grab) আঁখের শিকড় খেয়ে ক্ষতিসাধন করে।

৬. অনেক পোকা আছে যারা পাতা ও ফুলের মধ্যে ডিম পেড়ে ফসলের প্রচুর ক্ষতি করে। যেমন– স্ট্র বেরী উইভিল, কিছু কিছু বিটল ইত্যাদি।

৭. কিছু কিছু পোকা গাছের পাতা কেটে বাসা বাঁধে। যেমন– পাতা কাটা পিঁপড়া (Leaf cutting ants)।

৮. কিছু পোকা আছে যাদের উপস্থিতির কারণে অন্য পোকার আগমন দেখা যায়। যেমন– জাবপোকার উপস্থিতি থাকলে পিঁপড়ার আগমন ঘটে। কারণ– জাবপোকা কর্তৃক নিঃসৃত মধু খাবার জন্য পিঁপড়া আসে। এজন্য জাবপোকাকে পিঁপড়ার গাভী বলা হয়। এ ক্ষেত্রে পিঁপড়া কিন্তু সরাসরি গাছের কোনো ক্ষতি করেনা। তবে তার উপস্থিতি জাবপোকার জন্য কয়েকটি সহায়ক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে বংশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং তা থেকে গাছ আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এভাবে জাবপোকা আক্রান্ত গাছে পিঁপড়া পরোক্ষভাবে ক্ষতিসাধন করে থাকে।

৯. অনেক পোকা আছে যারা উদ্ভিদের রোগ বিস্তারে সহায়তা করে থাকে। যেমন– পাতার হপার ধানের টুংরো ভাইরাস ছড়িয়ে থাকে। জাবপোকাও ভাইরাস বহন করে।

পোকা মাকড় যে শুধু ফসলের ক্ষতিই করে থাকে এ কথা ঠিক নয়। অনেক পোকা মাকড় আছে যারা কৃষিক্ষেত্রে যথেষ্ট উপকারী প্রভাব রাখে।

১. অনেক পরভোজী (Predator) পোকা আছে যারা অন্যান্য ক্ষতিকর পোকাকে সরাসরি ধরে খেয়ে ফেলে এবং কৃষির উপর উপকারী প্রভাব রাখে। যেমন– লেডি বার্ড বিটল *(Menochilus sexmaculatus k.)* জাবপোকাকে ধরে খায়। এরকম ফড়িং, টাইগার বিটল, গ্রাউন্ড বিটল, প্রেইং ম্যানটিভ প্রভৃতি পোকা ক্ষতিকর পোকাকে ধরে খায়।

কিছু কিছু পরজীবী পোকা আছে যারা অন্য একটি পোকার দেহে বাস করে তাদের দূর্বল করে ও মেরে ফেলে। এরূপ পরজীবী পোকা ব্যবহার করে তাদের পোষক পোকাকে দমন করা যায়।

২. কিছু কিছু পরজীবী (Parasite) পোকা আছে যারা অন্য একটি পোকার দেহে বাস করে তাদের দূর্বল করে ও মেরে ফেলে। এরূপ পরজীবী পোকা ব্যবহার করে তাদের পোষক পোকাকে দমন করা যায়। যেমন– *Trichogramma sp.* আখের ডগার মাজরা পোকার ডিমের পরজীবী হিসেবে বাস করে তাকে ধ্বংস করে দেয়। *Apanteles sp.* পাটের ক্ষতিকর বিছা পোকার দেহে ডিম পাড়ে। এতে বিছা পোকা যখন পিউপেশনে যায় তখন পিউপা থেকে পাটের বিছা পোকার মথ বের না হয়ে *Apanteles sp.* এর পূর্ণাঙ্গ পোকা বের হয়। এছাড়া অনেক বিছা পোকা দূর্বল হয়ে মারাও যায়।

অনেক কীটপতঙ্গ আছে যাদের কারণে শিল্প গড়ে উঠেছে। যেমন– মৌমাছি, রেশম পোকা, লাক্ষা পোকা।

৩. ফসলের পরাগায়ন না হলে উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যহত হত। এ পরাগায়নে কীটপতঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং ফলন বাড়াতে সহায়তা করে থাকে। মৌমাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি পোকা ফসলের পরাগায়নে সাহায্য করে।

৪. অনেক কীটপতঙ্গ আছে যাদের কারণে শিল্প গড়ে উঠেছে। যেমন– মৌমাছি, রেশম পোকা, লাক্ষা পোকা। মৌমাছি আমাদেরকে মধু ও মোম দেয়। রেশম পোকা আমাদেরকে সিল্ক বা রেশম দেয় যা দ্বারা মূল্যবান কাপড় চোপড় তৈরি করা হয়। লাক্ষা পোকা আমাদেরকে গালা দেয়। এছাড়া কীটপতঙ্গের গল থেকে ট্যানিক এসিড ও কিছু কিছু প্রসাধন সামগ্রীর প্রয়োজনীয় উপাদান ও রঞ্জক পাওয়া যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে কীটপতঙ্গ থেকে ঔষধপত্রও তৈরি হয়ে থাকে।

৫. অনেক পোকা আছে যারা মাটিতে বাস করে এবং মৃত্তিকা বায় চলাচলে সহায়তা করে। অনেকে আবর্জনা খেয়ে হিউমাস তৈরিতে সাহায্য করে। যেমন– স্প্রিংটেইল, ক্লোফ্লিয়া ইত্যাদি। অনেক

গোবরে পোকা কৃষি জমির উর্বরতা রক্ষা ও বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার মৃত পোকার শরীর পচে গিয়ে মাটিতে পুষ্টি উপাদান যোগ করে।

৬. ফনিমনসা (Prickly pears) জাতীয় আগাছাকে দমন করার জন্য কীটপতঙ্গ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অস্ট্রেলিয়াতে ফনিমনসা জাতীয় আগাছা আক্রান্ত জমিতে আর্জেন্টিন মথ বিস্তার লাভ করলে উক্ত আগাছা সহজেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ক্যালিফোর্নিয়াতে সেন্ট জনসওয়ার্ট আগাছা দমনের জন্য ক্রাইসোলিনা গণের পাতা খেকো বিটল ছড়িয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। আগাছা দমনের এই পদ্ধতি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমা রাজ্যগুলোতে চালু আছে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কৃষিক্ষেত্রে কীটপতঙ্গ একতরফাভাবে শুধু ক্ষতিই করে না, বরং যথেষ্ট উপকারী প্রভাবও রাখে।

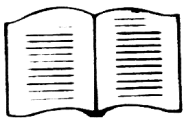

সারমর্ম ঃ পোকামাকড় মাঠ ফসল থেকে শুরু করে গোলাজাত শস্যের পর্যন্ত প্রচুর ক্ষতি করে থাকে। ক্ষতির পরিমাণ চরমে পৌঁছলে তা শতকরা ৮০-১০০ ভাগ পর্যন্ত হয়ে থাকে। আবার উপকারী প্রভাবও কম নয়। অনেক পরভোজী পোকা ক্ষতিকর পোকাকে ধরে খেয়ে ফেলে এবং পরজীবী পোকা ক্ষতিকর পোকার দেহে রোগ সৃষ্টি করে দূর্বল করে ও মেরে ফেলে। এছাড়া মৌমাছি মধু ও মোম দিয়ে, রেশম পোকা রেশম দিয়ে, লাক্ষা পোকা গালা দিয়ে, বিভিন্ন পোকা ফসলের পরাগায়নে মোট কথা বিভিন্নভাবে কীটপতঙ্গ মানুষের উপকার সাধন করে আসছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

ক. টুংরো ভাইরাস কোন্ পোকার মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে?

i) টাইগার বিটল
ii) কাঠ ছিদ্রকারী পোকা
iii) মৌমাছি
iv) পাতার হপার

খ. পরভোজী পোকা কোন্‌টি?

i) রেশম পোকা
ii) বিছা পোকা
iii) প্রেয়িং ম্যানটিড
iv) পামরী পোকা

২। সত্য হলে ''স'' এবং মিথ্যা হলে ''মি'' লিখুন।

ক. কীটপতঙ্গের আক্রমন চরমে পৌঁছলে শতকরা ৮০ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত ফসলের ক্ষতি হয়ে থাকে।

খ. ঘাস ফড়িং পাতা থেকে রস শোষণ করে ফসলের ক্ষতি করে।

৩। শুন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. উঁইপোকা আখের ---------- খেয়ে ক্ষতিসাধন করে।

খ. ---------- পোকা আমাদেরকে গালা দেয়।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. কোন্ পোকাকে পিঁপড়ার গাভী বলা হয়?

খ. কোন্ পরভোজী পোকা জাবপোকাকে ধরে খায়?

পাঠ ১.৩ পোকার দেহের বিভিন্ন অংশের পরিচিতি

এ পাঠ শেষে আপনি–

- পোকা ও মাকড়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন।
- পোকার মাথা, বক্ষ ও পেট সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- পোকার মুখোপাঙ্গ, শুঙ্গ ও পায়ের বিভিন্ন অংশের নাম বলতে পারবেন।
- পোকার পাখার সাধারণ শিরাবিন্যাস সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন।

কবির ভাষায়– দিনে মশা রাতে মাছি এ নিয়ে বেঁচে আছি। আমরা মশা মাছিকেই মূলতঃ পোকা বলে জেনে আসছি অনেক ছোটবেলা থেকে। অনেকে আবার পোকা মাকড়ও বলে থাকে। আসলে পোকা আর মাকড় সম্পর্ণ ভিন্ন এবং এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। পোকার তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, যথা– ১. তিন জোড়া পা থাকবে, ২. মাথায় শুঙ্গ থাকবে এবং ৩. দেহ মাথা, বক্ষ ও পেট এই তিন অংশে বিভক্ত থাকবে। কিন্তু মাকড়ের বেলায় ১. চার জোড়া পা থাকবে ২. মাথায় শুঙ্গ থাকবে না এবং ৩. দেহ সেফালোথোরাক্স (Cephalothorax) ও পেট এই দুই অংশে বিভক্ত থাকবে।

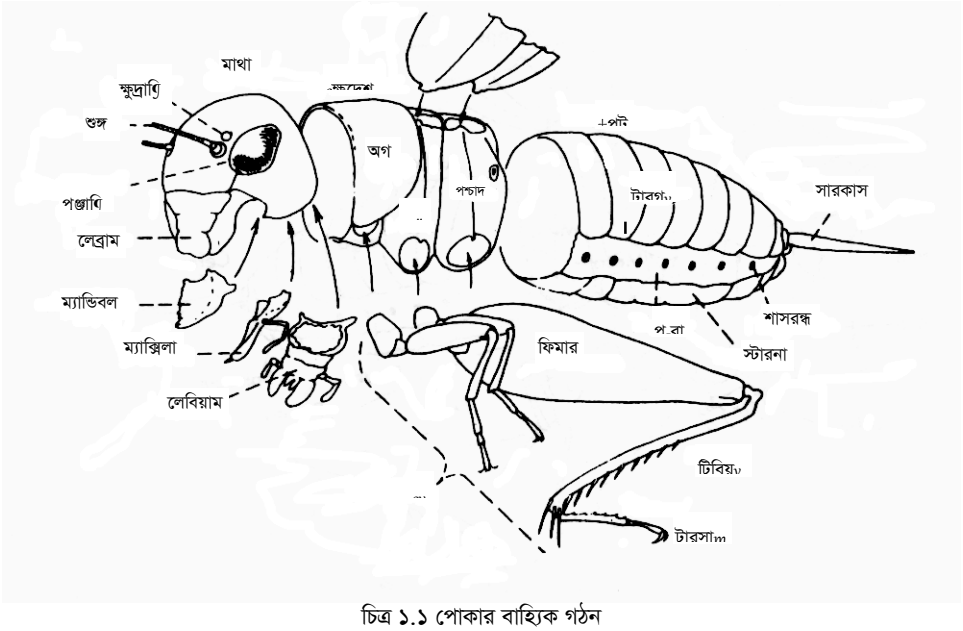

চিত্র ১.১ পোকার বাহ্যিক গঠন

পোকার দেহের তিনটি অংশ আবার পর পর কতগুলো খন্ড (segment) নিয়ে গঠিত। প্রতিটি খন্ডের পৃষ্ঠদেশকে টারগাম (বহুবচন- Terga), অঙ্কীয়দেশকে স্টারনাম (বহুবচন- Sterna) এবং এই দুই অংশের মধ্যবর্তী অংশকে প্লুরন (বহুবচন- Pleura) বলা হয়। পোকার দেহের উপরিভাগে কাইটিন ছাড়াও বেশ কিছু পদার্থ এসে জমা হয়। এসব পদার্থ কতগুলো শক্ত প্লেটের সৃষ্টি করে যাদেরকে স্ক্লেরাইট (Sclerite) বা স্ক্লেরা (Sclera) বলে। এ শক্ত প্লেটগুলো টারগাম, স্টারনাম ও প্লুরনে অবস্থান করে। টারগামে অবস্থিত প্লেটকে টারগাইট (Tergite), স্টারনামে অবস্থিত প্লেটকে স্টারনাইট (Sternite) এবং প্লুরার প্লেটকে প্লুরাইট (Pleurite) বলা হয়। কিন্তু দেহের উভয় দিকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কোনো স্ক্লেরা থাকে না। ঐ অংশে পাতলা আবরণ থাকে যেখানে শ্বাসরন্ধ্রগুলো (Spiracles) অবস্থান করে।

মুখোপাঙ্গের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে তিন প্রকার মাথা দেখা যায় যেমন–অধঃমুখী মাথা, সন্মুখমুখী মাথা এবং পশ্চাদমুখী মাথা।

মাথা (Head)

পোকার মাথায় চোখ, শুঙ্গ ও মুখোপাঙ্গ রয়েছে। মুখোপাঙ্গের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে তিন প্রকার মাথা দেখা যায়। ১. অধঃমুখী মাথা (hypognathous head) যেখানে মুখের উপাঙ্গগুলো নিচের দিকে

মুখ করে থাকে। ২. সন্মুখমুখী মাথা (Prognathous head) যেখানে মুখোপাঙ্গগুলো সামনের দিকে মুখ করে থাকে এবং ৩. পশ্চাদমুখী মাথা (Opisthognathous head) যাতে মুখোপাঙ্গগুলো দেহের নিচে কিন্তু পিছন দিকে মুখ করে অবস্থান করে। পোকার মুখোপাঙ্গে লেব্রাম বা উপরের ওষ্ঠ, লেবিয়াম বা নিচের ওষ্ঠ, ম্যান্ডিবল এবং ম্যাক্সিলা থাকে। ম্যাক্সিলা সবসময় কার্ডো, স্টাইপস, ম্যাক্সিলারী পাল্প, গ্যালিয়া ও ল্যাসিনিয়া নিয়ে গঠিত এবং ল্যাবিয়াম সবসময় সাবমেন্টাম, মেন্টাম, প্রিমেন্টাম, ল্যাবিয়াল পাল্প, প্যারাগ্লসা ও গ্লসা নিয়ে গঠিত। ম্যাক্সিলা ও ল্যাবিয়ামের গঠন চিত্র সহকারে নিম্নে দেখানো হলো।

চিত্র ১.২ ম্যাক্সিলা

চিত্র ১.৩ ল্যাবিয়াম

বেশির ভাগ পতঙ্গের পেডিসেল জনস্টন অঙ্গ (Johnston's organ) নামে এক প্রকার চলাচলের জন্য সুক্ষ অনুভূতি সম্পন্ন অঙ্গ থাকে যা ভার-সাম্যের জন্য প্রয়োজন।

কীটপতঙ্গের দু'ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চোখ রয়েছে ঃ ক্ষুদ্রাক্ষি (eOcllus) ও পুঞ্জাক্ষি (Compound eye)। ক্ষুদ্রাক্ষির সংখ্যা ৩,২ বা অনুপস্থিত এবং পুঞ্জাক্ষি এক জোড়া থাকে। এ ছাড়া অপ্রাপ্ত বয়স্ক পোকাতে স্টেমাটা নামে আরও এক প্রকার চোখ রয়েছে। কীটপতঙ্গ সব জিনিসের ছবি উল্টোভাবে দেখে এবং নড়াচড়া না করলে জিনিসটিকে ঠিকভাবে দেখতে পারে না। পোকার মাথার সন্মুখ ভাগে দুই চোখের মধ্যবর্তী অংশে দু'টো শুঙ্গ (Antenna) থাকে। এই শুঙ্গের তিনটি অংশ থাকে। যথা, স্কেপ (Scape), পেডিসেল (Pedicel) ও ফ্ল্যাজেলাম (Flagellum) বা ক্ল্যাভোলা (Clavola)। স্কেপ শুঙ্গের প্রথম অংশ এবং এর সাহায্যে মাথার সাথে যুক্ত থাকে। পেডিসেল হলো দ্বিতীয় অংশ যার দৈর্ঘ্য খুব কম এবং বেশির ভাগ পতঙ্গের এ অংশে জনস্টন অঙ্গ (Johnston's organ) নামে এক প্রকার চলাচলের জন্য সুক্ষ অনুভূতি সম্পন্ন অঙ্গ থাকে যা ভারসাম্যের জন্য প্রয়োজন। শুঙ্গের শেষ অংশ হলো ফ্ল্যাজেলাম যা সবচেয়ে লম্বা এবং অনেকগুলো খন্ডাংশ নিয়ে গঠিত।

চিত্র ১.৪ পোকার স্বাভাবিক শুঙ্গ

বক্ষ (Thorax)

পোকার বক্ষদেশ অগ্রবক্ষ (Prothorax), মধ্যবক্ষ (Mesothorax) ও পশ্চাদবক্ষ (Metathorax) এই তিন অংশে বিভক্ত থাকে। এই তিন অংশ থেকে তিন জোড়া পা উৎপন্ন হয় যা মূলত পোকা হাঁটা বা চলাফেরার কাজে ব্যবহার করে থাকে। পোকার স্বাভাবিক একটা পা সাধারণত কক্সা (Coxa), ট্রকেন্টার (Trochanter), ফিমার (Femur), টিবিয়া (Tibia), টারসাস (Tarsus) ও প্রিটারসাস (Pretarsus) অংশ নিয়ে গঠিত। কক্সা পায়ের প্রথম অংশ যার আকৃতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গোলাকার এবং এর সাহায্যে দেহের সাথে পা লেগে থাকে। ট্রকেন্টার পায়ের দ্বিতীয় অংশ যার আকৃতি অনেক ছোট। এটি একটি কব্জার সাহায্যে কক্সার সঙ্গে স্বাধীনভাবে নড়াচড়া করার সুযোগ পায়। ফিমার হলো পায়ের সবচেয়ে বড় এবং শক্তিশালী অংশ। টিবিয়া খুব সরু, লম্বায় ফিমারের চেয়ে কিছু খাটো এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বড়ও দেখা যায়। টিবিয়ার শেষপ্রান্তে কিছু কিছু সূক্ষ্ম কাঁটা বা লোম থাকে। টারসাস সাধারণত দুই থেকে পাঁচটি উপখন্ডাংশে বিভক্ত থাকে যাদেরকে টারসোমিয়ার (Tarsomere) বলা হয়। টারসাসের অগ্রভাগে পায়ের শেষ খন্ডাংশই হল প্রিটারসাস। প্রিটারসাস সাধারণত সূক্ষ্ম বাঁকা নখের (Claw) মত দেখা যায়। এর সাহায্যে পোকা সম্ভবত কোনো কিছু আকড়িয়ে ধরে রাখার কাজ করে থাকে।

চিত্র ১.৫ পোকার পায়ের বিভিন্ন অংশ

পোকার মধ্যবক্ষ ও পশ্চাদবক্ষ থেকেই দুই জোড়া পাখা উৎপন্ন হয়। অগ্রবক্ষ থেকে কোনো পাখা সৃষ্টি হয় না।

পোকার মধ্যবক্ষ ও পশ্চাদবক্ষ থেকে দুই জোড়া পাখা উৎপন্ন হয়। উল্লেখ্য যে, অগ্রবক্ষ থেকে কোনো পাখা সৃষ্টি হয় না। বেশিরভাগ পোকার পাখাই দেখতে পাতলা পর্দার মত। এই পাখার সুস্পষ্ট একটা কাঠামো রয়েছে এবং পাখার মধ্যে অনেক শিরা আছে। পাখায় অবস্থিত শিরার সংখ্যা ও বিন্যাস পদ্ধতি দেখে অনেক পতঙ্গ শনাক্ত করা যায়। পোকার স্বাভাবিক একটা পাখায় সাধারণত লম্বালম্বি শিরা, আড়াআড়ি শিরা, যুগ্ম শিরা, অতিরিক্ত শিরা ও আনুষাঙ্গিক শিরা বিশেষ নিয়মে সজ্জিত থাকে। শিরাগুলোর মধ্যবর্তী স্থানকে কোষ বলা হয়। কোষগুলো পাখার শেষ প্রান্তের দিকে থাকলে উন্মুক্ত কোষ এবং শিরা দ্বারা বেষ্টিত থাকলে তাদেরকে বদ্ধ কোষ বলে। ডিপটেরা বর্গের কোনো কোনো পোকার পাখার উপরে অতিসূক্ষ্ম লোম ও লেপিডপ্টেরা বর্গের পোকার পাখায় লোমের পরিবর্তে অসংখ্য আঁশ থাকে এবং কোনো কোনো পোকার পাখার কস্টার (একটি প্রধান অবিভক্ত শিরা) প্রান্তে একটা স্বচ্ছ দাগ দেখা যায় যাকে স্টিগমা বলা হয়।

চিত্র ১.৬ কীটপতঙ্গের পাখার সাধারন শিরাবিন্যাস

C =কস্টা, Sc = সাবকস্টা, R = রেডিয়াস, M = মিডিয়া, Cu = কিউবিটাস, A =অ্যানাল ,

পেট (Abdomen)

পোকার বক্ষের পিছনের অংশকে পেট বলা হয়। পোকার পেট স্পষ্ট ১১ বা ৮ বা তার চেয়ে কম সংখ্যক খন্ডাংশ নিয়ে গঠিত।

পোকার বক্ষের পিছনের অংশকে পেট বলা হয়। পোকার পেট স্পষ্ট ১১ বা ৮ বা তার চেয়ে কম সংখ্যক খন্ডাংশ নিয়ে গঠিত। অধিকাংশ পোকার পেট স্বাভাবিকভাবে ১১ খন্ডাংশ নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। স্পী জাতীয় পোকার পেটের অষ্টম ও নবম খন্ডাংশ এবং পুরুষ জাতীয় পোকার পেটের নবম খন্ডাংশ জনন খন্ডাংশ (Genital segment) নামে পরিচিত। এর আগের খন্ডাংশগুলোকে প্রাকজনন খন্ডাংশ (Pregenital segment) এবং পরেরগুলোকে জননোত্তর খন্ডাংশ (Postgenital segment) বলা হয়। সাধারণত অষ্টম ও নবম খন্ডাংশের উপাঙ্গ বা বহিরাংশ বাহ্যিক জনন অঙ্গ গঠন করে থাকে। পেটের শেষ প্রান্তে লেজের মত অংশকে টেলসন (Telson) বা সারকাস (Cercus) বলা হয়।

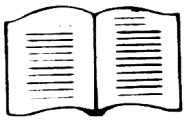

সারমর্ম ঃ পোকা ও মাকড় সম্পর্ণ ভিন্ন জিনিষ। পোকার দেহ মাথা, বক্ষ ও পেট এই তিন অংশে বিভক্ত। মাথায় চোখ, শুঙ্গ ও মুখোপাঙ্গ থাকে। ক্ষুদ্রাক্ষি ও পুঞ্জাক্ষি দু'ধরনের চোখ পোকায় থাকে। স্কেপ, পেডিসেল ও ফ্ল্যাজেলাম নামে তিনটি অংশ শুঙ্গে বর্তমান। পোকার মুখে লেব্রাম, ল্যাবিয়াম, ম্যান্ডিবল ও ম্যাক্সিলা নামে চার ধরনের উপাঙ্গ আছে। পোকার বক্ষদেশ তিন ভাগে বিভক্ত যথা- অগ্রবক্ষ, মধ্যবক্ষ ও পশ্চাদবক্ষ। বক্ষদেশের তিন অংশ থেকে তিন জোড়া পা এবং মধ্য ও পশ্চাদ বক্ষ থেকে দু'জোড়া পাখা উৎপন্ন হয়। পোকার পা কক্সা, ট্রকেন্টার, ফিমার, টিবিয়া, টারসাস ও প্রিটারসাস নিয়ে গঠিত। অধিকাংশ পোকার পাখাই পাতলা পর্দার মত এবং এই পাখায় বিভিন্ন ধরনের শিরা একটা বিশেষ নিয়মে সজ্জিত থাকে। পোকার পেটে জনন খন্ডাংশ থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

ক. ফ্ল্যাজেলাম কোন্ অঙ্গের অংশ?

i) পায়ের ii) মুখের
iii) শুঙ্গের iv) পেটের

খ. পোকার পায়ের কোন্ অংশটি সবচেয়ে বড়?

i) কক্সা ii) ট্রকেন্টার
iii) ফিমার iv) টিবিয়া

২। সত্য হলে ''স'' এবং মিথ্যা হলে ''মি'' লিখুন।

ক. কীটপতঙ্গের দু'ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চোখ রয়েছে।
খ. ল্যাবিয়াম পোকার পায়ের একটি অংশ।

৩। শুন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. টারগামে অবস্থিত প্লেটকে ---------- বলে।
খ. --------- এর অগ্রভাগে পায়ের শেষ খন্ডাংশই হলো প্রিটারসাস।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. পোকার বক্ষদেশ কয়ভাগে বিভক্ত?
খ. কক্সা পোকার কিসের অংশ?

পাঠ ১.৪ পোকার বিভিন্ন মুখাবয়ব ও তাদের বিবরণ

এ পাঠ শেষে আপনি–

- কীটপতঙ্গের বিভিন্ন প্রকার মুখোপাঙ্গের নাম বলতে পারবেন।
- কীটপতঙ্গের বিভিন্ন প্রকার মুখোপাঙ্গের বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার মুখোপাঙ্গের সাহায্যে কীটপতঙ্গ কিভাবে খাদ্য খেয়ে থাকে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কীটপতঙ্গের মুখে যে সমস্ত উপাঙ্গ থাকে এবং তাদের খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় তাদেরকে মুখোপাঙ্গ বা মুখের উপাঙ্গ (Mouth Parts) বলে। যেমন– উপরের ওষ্ঠ বা লেব্রাম, নিচের ওষ্ঠ বা লেবিয়াম, ম্যান্ডিবল, ম্যাক্সিলা এবং জিহ্বা (Hypo-pharynx) বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আলজিহ্বা (Superlinguae) থাকে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বের পাঠে দেয়া আছে। মুখের উপাঙ্গগুলো পতঙ্গের খাদ্যবস্তু গ্রহণ করার কাজে সহায়তা করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের জন্য এদের মুখোপাঙ্গও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তাই নির্দিষ্ট কোনো ধরনের মুখোপাঙ্গ দ্বারা কেবল নির্দিষ্ট কোনোপ্রকার খাদ্য গ্রহণ করাই সম্ভব হয়ে থাকে। কীটপতঙ্গে যে সমস্ত ধরনের মুখোপাঙ্গ দেখা যায় তা নিচে উল্লেখ করা হল।

১. চর্বনকারী (Chewing type)
২. কর্তন ও শোষণকারী (Cutting and sponging type)
৩. শোষণকারী (Sponging type)
৪. চর্বন ও লেহনকারী (Chewing and lapping type)
৫. অনুবিদ্ধন ও চোষণকারী (Piercing and sucking type)
৬. সাইফনিং বা নলাকার (Siphoning tube type)

চর্বনকারী মুখোপাঙ্গ

চর্বনকারী মুখোপাঙ্গই কীটপতঙ্গের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। অন্যান্য যে সব মুখোপাঙ্গ আছে তা মূলত এর পরিবর্তিত রূপ।

এ ধরনের মুখোপাঙ্গে ম্যান্ডিব্‌ল বেশ শক্ত ও সবল থাকে যা খাদ্যবস্তুকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। পরে ম্যাক্সিলা ও লেবিয়াম ঐ খাদ্যবস্তুকে আরও চূর্ণবিচূর্ণ করে অন্ননালীর দিকে ঠেলে দেয়। ফড়িং, আরশোলা, প্রজাপতি ও মথের লার্ভা বা শুককীট, পরভূক চেলেপোকা, সৈনিক পিঁপড়া প্রভৃতি কীটপতঙ্গে এ ধরনের মুখোপাঙ্গ দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের মুখোপাঙ্গই কীটপতঙ্গের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। অন্যান্য যে সব মুখোপাঙ্গ আছে তা মূলত এর পরিবর্তিত রূপ। এ সম্পর্কে দুটো প্রমাণ দেয়া যায়– এক. কীটপতঙ্গের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেনটিপেড এবং সিমফাই-লাতে এ রকম মুখোপাঙ্গ আছে। দুই. অধিকাংশ গোত্রের (Family) পতঙ্গে এবং অনেক গোত্রের পতঙ্গের লার্ভাতে এ ধরনের মুখোপাঙ্গ থাকে।

চিত্র ১.৭ চর্বনকারী মুখোপাঙ্গ

কর্তন ও শোষণকারী মুখোপাঙ্গ

কীটপতঙ্গের এ ধরনের মুখোপাঙ্গের ম্যান্ডিবল সাধারণত ধারালো ব্লেডের মত হয়ে থাকে। এদের ম্যাক্সিলা সরু ও লম্বা হয়ে থাকে। এ রকম ম্যান্ডিবল ও ম্যাক্সিলার সাহায্যে ঘোড়া (ডাকু) মাছি (Horse fly) স্তন্যপায়ী প্রাণীর ত্বক বা চামড়া কেটে ফেলে এবং সেই কাটা স্থান থেকে যে রক্ত বের হয় তা তাদের লেবিয়াম দ্বারা শোষণ করে জিহ্বার শেষ প্রান্তে পৌঁছে দেয়। এ জাতীয় পোকার জিহ্বা ও আলজিহ্বা একসংগে মিলে গিয়ে একটা নালীর সৃষ্টি করে। পরে রক্ত সেই নালীর ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে অন্ননালীর ভিতর প্রবেশ করে। ডিপটেরা বর্গের অন্তর্ভুক্ত ব্র্যাকাইসেরা উপবর্গের আওতাধীন ট্যাবানিড জাতীয় মাছিতে এ ধরনের মুখোপাঙ্গ দেখা যায়।

চিত্র ১.৮ কর্তন ও শোষণকারী মুখোপাঙ্গ

শোষণকারী মুখোপাঙ্গ

শোষনকারী মুখোপাঙ্গে ম্যান্ডি-বল ও স্পষ্ট ম্যাক্সিলা নেই। তবে ম্যাক্সিলাকে এক জোড়া পাল্পের দ্বারা কেবল শনাক্ত করা যায়।

এ জাতীয় মুখোপাঙ্গে ম্যান্ডিবল ও স্পষ্ট ম্যাক্সিলা নেই। তবে ম্যাক্সিলাকে এক জোড়া পাল্পের দ্বারা কেবল শনাক্ত করা যায়। সুতরাং ম্যান্ডিব্‌ল ও ম্যাক্সিলার কোনো কাজ নেই। এ ধরনের মুখোপাঙ্গে ল্যাবিয়ামের সংকোচন করার ক্ষমতা থাকে এবং ল্যাবিয়াম খুব মাংশল থাকে। এই ল্যাবিয়াম রূপান্তরিত হয়ে শুঁড়ের আকার ধারণ করে যার অগ্রভাগ প্রশস্ত থাকে এবং একে ল্যাবেলা বলা হয়। ল্যাবেলার চারিদিকে অনেকগুলো সরু সরু নালিকা থাকে। ল্যাবেলা তরল খাবারের উপর পড়লে বা শক্ত খাবারের (যেমন–চিনি) উপর পড়লে লালার সংস্পর্শে তা তরল হয়ে ল্যাবেলার সংকোচনশীল ক্ষমতা থাকায় তার নালিকা দিয়ে শোষিত হয় এবং পরে তা অন্ননালীর ভিতর প্রবেশ করে। ঘরের মাছিতে এ রকম মুখোপাঙ্গ দেখা যায়।

চিত্র ১.৯ শোষণকারী মুখোপাঙ্গ

চর্বন ও লেহনকারী মুখোপাঙ্গ

ল্যাব্রাম, ল্যাবিয়াম, ম্যান্ডিবল ও ম্যাক্সিলা নিয়ে এ রকম মুখোপাঙ্গ গঠিত। এ ধরনের মুখোপাঙ্গে ম্যাক্সিলা ও ল্যাবিয়াম পাশাপাশি মিলে একটা লম্বা লেহন জিভ বা নলের সৃষ্টি করে। এ জিভ বা নলকে গ্লসা বলা হয়। গ্লসার দ্রুত সংকোচন ও প্রসারণ ক্ষমতা থাকায় ফুলের ভিতর থেকে সহজে মধু সংগ্রহ করতে পারে। অনেকের ধারণা যে, এ জাতীয় মুখোপাঙ্গ বিশিষ্ট পোকা ফুলের মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে মধুকোষের ভিতরে গ্লসা ছুড়ে দেয় এবং গ্লসার প্রান্ত দিয়ে মধু চুষে নেয়। ইমস্ এর মতে গ্লসার অক্ষীয় নালী দিয়ে তরল খাবার ক্যাপিলারী শক্তিতে উপরে উঠে এবং পেশী সংকোচনের সাহায্যে গ্লসা সংকুচিত হয়ে তরল খাবার উপরের দিকে নিয়ে আসে। বোলতা, মৌমাছি প্রভৃতি পোকায় এ ধরনের মুখোপাঙ্গ দেখা যায়।

চর্বন ও লেহনকারী মুখোপাঙ্গে ম্যাক্সিলা ও ল্যাবিয়াম পাশাপাশি মিলে একটা লম্বা লেহন জিভ বা নলের (গ্লসা) সৃষ্টি করে। গ্লসা দ্বারা ফুলের ভিতর থেকে সহজে মধু সংগ্রহ করতে পারে।

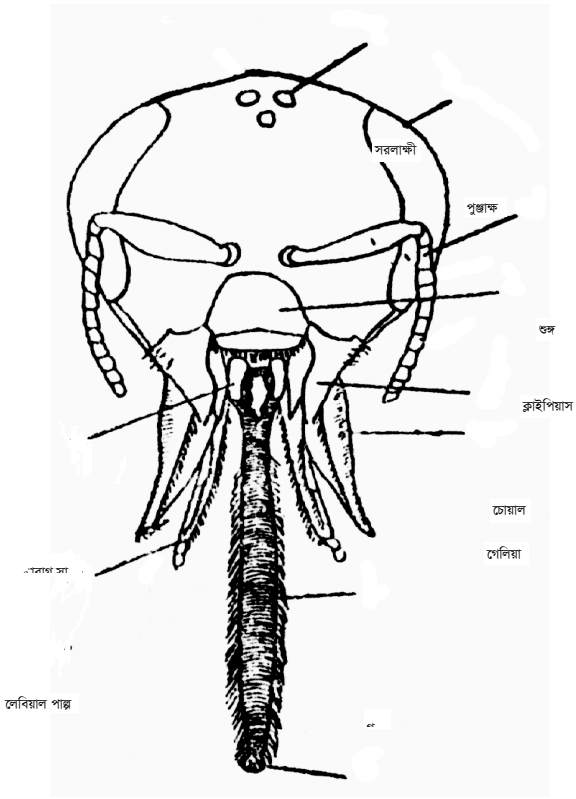

চিত্র ১.১০ চর্বন ও লেহনকারী মুখোপাঙ্গ

অনুবিদ্ধন ও চোষণকারী মুখোপাঙ্গ

এ রকম মুখোপাঙ্গ লম্বা নলের মত যা সন্ধিযুক্ত থাকে। নলের মধ্যে সূচের মত কতগুলো স্টাইলেট অবস্থান করে। এ ধরনের মুখোপাঙ্গে ম্যান্ডিবল, ম্যাক্সিলা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জিহবা আকারে সরু ও লম্বা হয়ে সূচে পরিণত হয়। ল্যাব্রাম এ সূচকে শক্তভাবে অবস্থান করতে সাহায্য করে। নলের বাইরের আবরণটা হলো ল্যাবিয়াম। খাদ্য গ্রহণকালে এ ধরনের মুখোপাঙ্গ বিশিষ্ট কীটপতঙ্গ তাদের নল বা ঠোট উদ্ভিদ বা প্রাণীর ত্বকের উপর স্থাপন করে। এতে সূচের মত স্টাইলেট ত্বকের ভিতর প্রবেশ করে এবং উদ্ভিদ বা প্রাণী থেকে রস বা রক্ত চোষণ করে নেয়। যেমন– ছাতরা পোকা, জাবপোকা এ ধরনের মুখোপাঙ্গের সাহায্যে উদ্ভিদ থেকে রস চোষণ করে নেয়। আবার ছারপোকা,মশা প্রভৃতি স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহ থেকে রক্ত চোষণ করে নেয়।

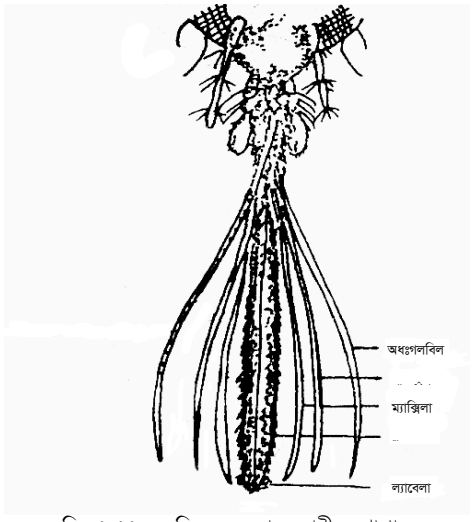

চিত্র ১.১১ অনুবিদ্ধন ও চোষনকারী মুখোপাঙ্গ

সাইফনিং মুখোপাঙ্গ

সাইফনিং মুখোপাঙ্গের পেচানো প্রোবোসিস সোঁজা করে এর অগ্রভাগ তরল খাবারের উপর স্থাপন করে এবং তরল খাবার টেনে নেয়।

এ ধরনের মুখোপাঙ্গে সাধারণত ম্যান্ডিবল থাকে না। ম্যাক্সিলার পাল্পের কিছু অংশ রয়েছে এবং ল্যাব্রাম খুব ছোট থাকে। ল্যাবিয়ামের গোড়ার অংশ এবং তিন খন্ডাংশ বিশিষ্ট পাল্প ছাড়া অন্য কিছুই দেখা যায় না। ম্যাক্সিলার গ্যালিয়া অংশ অত্যন্ত লম্বা এবং দুটো গ্যালিয়া একত্রে মিলে একটা সরু ফাঁপা নলের সৃষ্টি করে। এ নল ব্যবহারহীন অবস্থায় মাথার নিচের দিকে ঘড়ির স্প্রিংয়ের মত পেচানো থাকে যাকে প্রবোসিস বলা হয়। পেচানো প্রোবোসিস সোঁজা করে এর অগ্রভাগ তরল খাবারের উপর স্থাপন করে এবং তরল খাবার টেনে নেয়। প্রজাপতি ও মথে এ ধরনের মুখোপাঙ্গ দেখা যায়।

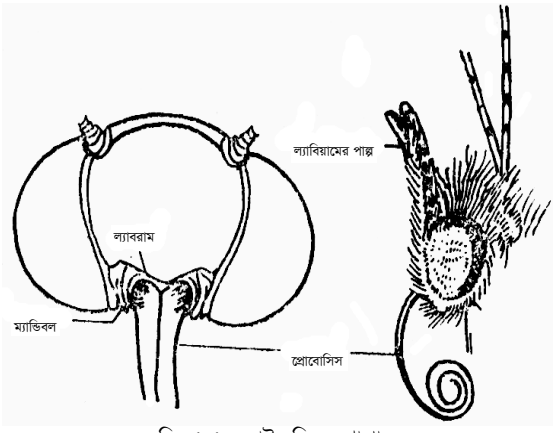

চিত্র ১.১২ সাইফনিং মুখোপাঙ্গ

অনুশীলন (Activity) ঃ *মাছি ও মশার মুখোপাঙ্গের ধরন কী? কীভাবে এরা খাবার খায় তার প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।*

সারমর্ম ঃ পোকার মুখে সাধারণত লেব্রাম, ল্যাবিয়াম, ম্যান্ডিবল ও ম্যাক্সিলা নামে উপাঙ্গ থাকে এবং এগুলো খাদ্য গ্রহণে সাহায্য করে। এ উপাঙ্গগুলো পরিবর্তিত হয়ে পতঙ্গভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে বিধায় মুখোপাঙ্গ বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে, যেমন– চর্বনকারী, কর্তন ও শোষণকারী, চর্বন ও লেহনকারী, অনুবিদ্ধন ও চোষণকারী এবং সাইফনিং বা নলাকার মুখোপাঙ্গ। মুখোপাঙ্গের ধরন অনুযায়ী কীটপতঙ্গের খাদ্যের ধরণ খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া বিভিন্ন হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

ক. প্রবোসিস কোন্ পোকায় থাকে?

i) মশা ii) প্রজাপতি
iii) ঘাস ফড়িং iv) ছারপোকা

খ. গ্যালিয়া কার অংশ?

i) ম্যাক্সিলা ii) ম্যান্ডিবল
iii) ল্যাব্রাম iv) ল্যাবিয়াম

২। সত্য হলে ''স'' এবং মিথ্যা হলে ''মি'' লিখুন।

ক. ঘোড়া মাছির মুখোপাঙ্গ চর্বোনোপযোগী।
খ. প্রজাপতিতে সাইফনিং টাইপ মুখোপাঙ্গ দেখা যায়।

৩। শুন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. জাবপোকার মুখোপাঙ্গ ---------- ধরনের।
খ. শোষণকারী মুখোপাঙ্গে ------- ও ------- নেই।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. ম্যাক্সিলা পোকার কিসের উপাঙ্গ?
খ. ঘরের মাছিতে কী ধরনের মুখোপাঙ্গ থাকে?

পাঠ ১.৫ পোকার বিভিন্ন প্রকার পাখা, পা ও শুঙ্গ এবং তাদের বিবরণ

এ পাঠ শেষে আপনি–

- পোকার বিভিন্ন প্রকার পাখা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পোকার বিভিন্ন প্রকার পা সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পোকার বিভিন্ন প্রকার শুঙ্গের নাম লিখতে পারবেন।
- পোকার শুঙ্গের কার্যাবলী উল্লেখ করতে পারবেন।

পোকার পাখা (Insect wings)

পতঙ্গের দু'জোড়া পাখা থাকে। প্রথম জোড়া মধ্যবক্ষ (Mesothorax) ও দ্বিতীয় জোড়া পশ্চাৎবক্ষ (Metathorax) থেকে উৎপন্ন হয়। অগ্রবক্ষ (Prothorax) থেকে কখনও পাখা গজায় না। পাখা থাকার দরুণ পতঙ্গ সহজেই উড়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। পৃথিবীতে অধিকাংশ পতঙ্গেরই পাখা আছে, তবে পাখাহীন পতঙ্গের সংখ্যাও কম নয়। পাখাধারী পতঙ্গের মধ্যেও লক্ষ্য করা গেছে এদের অনেকেরই বছরের সবসময় পাখা থাকে না। উদাহরণস্বরূপ এফিডের কথা বলা যায়। এফিডের পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় কিছুসংখ্যক পতঙ্গে পাখা থাকে। কিন্তু কিছু সংখ্যকে একেবারেই পাখা থাকে না। সেরকম উঁইপোকা ও পিপড়ার স্পী পতঙ্গে পাখা থাকে না। পাখাধারী যে সব পতঙ্গে পাখা নেই তা আসলে প্রাথমিক অবস্থা নয়, বরং এটা হল মাধ্যমিক অবস্থা। ধরে নেয়া যেতে পারে, বিশেষ কোনো কারণে তারা পাখাহীন হয়ে পড়েছে।

পতঙ্গের দু'জোড়া পাখা থাকে। প্রথম জোড়া মধ্যবক্ষ ও দ্বিতীয় জোড়া পশ্চাৎবক্ষ থেকে উৎপন্ন হয়। অগ্রবক্ষ থেকে কখনও পাখা গজায় না।

কীটপতঙ্গে বিভিন্ন প্রকার পাখা দেখা যায় যা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল–

হলটেয়ার (Haltare)

ঘরের মাছিতে (House fly) এ ধরনের পাখা দেখা যায়। এদের প্রথম জোড়া পাখা উড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় জোড়া পাখা না থেকে সেখানে একটা অতি ছোট অংশ থাকে যাকে হলটেয়ার বলা হয়। এই হলটেয়ার উড়ার সময় দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে।

ইলাইট্রা (Elytra)

অনেক পতঙ্গ আছে যাদের সামনের পাখা জোড়ার সম্পর্ণ অংশই খুব শক্ত থাকে, কিন্তু পিছনের জোড়া ঝিল্লীবৎ (Membranous) থাকে। সামনের এই শক্ত পাখাকে ইলাইট্রা বলা হয়। কলিওপটেরা বর্গের বিটল ও উইভিল জাতীয় পোকায় এ ধরনের পাখা দেখা যায়। যেমন– গোবরে পোকা (Dung beetle)। পোকা যখন বিশ্রামের সময় পিছনের ঝিল্লীবৎ পাখা শরীরের সাথে গুটিয়ে রাখে তখন সামনের শক্ত পাখা ঝিল্লীবৎ পাখাদ্বয়কে ঢেকে রাখে। ঝিল্লীবৎ এই পাখা পোকা উড়ার কাজে ব্যবহার করে থাকে।

হেমিলাইট্রা (Hemelytra)

কিছুসংখ্যক পোকার সামনের পাখার গোড়ার দিকের অর্ধেক অংশ শক্ত থাকে, কিন্তু অগ্রভাগের অর্ধেক অংশ ঝিল্লীবৎ থাকে। এ ধরনের পাখাকে হেমিলাইট্রা বলে। হেমিপটেরা বর্গের আওতাধীন হেটেরো-পটেরা উপবর্গের পোকায় এ ধরনের পাখা দেখা যায়। যেমন– ধানের গান্ধী পোকা। সামনের পাখার শক্ত অর্ধেক অংশের উপরের অর্ধেককে কোরিয়াম এবং নিচের অর্ধেককে ক্ল্যাভাস বলা হয়।

কিছুসংখ্যক পোকার সামনের পাখার গোড়ার দিকের অর্ধেক অংশ শক্ত থাকে, কিন্তু অগ্রভাগের অর্ধেক অংশ ঝিল্লীবৎ থাকে। এ ধরনের পাখাকে হেমিলাইট্রা বলে।

ট্যাগমিনা (Tegmina)

অনেক কীটপতঙ্গ আছে যাদের সামনের পাখা জোড়া শক্ত হয়ে চামড়ার মত আকার ধারণ করে এ ধরনের পাখাকে ট্যাগমিনা বলা হয়। অর্থোপটেরা বর্গের পোকায় এ রকম পাখা দেখা যায়। যেমন– ঘাস ফড়িং, উঁড়চূঙ্গা ইত্যাদি।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামনের পাখার সাথে পিছনের পাখা কোনো কিছু দ্বারা যুক্ত থাকে এবং এর ফলে দু'জোড়া পাখা পৃথকভাবে কাজ না করে একই সাথে কাজ করে।

সামনের পাখা ও পিছনের পাখা সাধারণত পরস্পর থেকে পৃথক থাকে এবং উড়বার সময় পৃথকভাবে কাজ করে থাকে। কিন্তুকোনো কোনো ক্ষেত্রে সামনের পাখার সাথে পিছনের পাখা কোনো কিছু দ্বারা যুক্ত থাকে এবং এর ফলে দু'জোড়া পাখা পৃথকভাবে কাজ না করে একই সাথে কাজ করে। পাখাদ্বয়ের যুক্তকারী এ বস্তুগুলোর বিভিন্ন নাম আছে, যেমন হ্যামুলি, জুগাম, ফ্রেনুলাম এবং রেটিনাকুলাম।

পোকার পা (Insect legs)

পোকার বক্ষদেশে তিনটি খন্ডাংশ আছে, যথা– অগ্রবক্ষ, মধ্যবক্ষ ও পশ্চাৎবক্ষ। এই তিন খন্ডাংশ থেকে তিন জোড়া পা উৎপন্ন হয়। পোকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল তিন জোড়া পা। পৃথিবীতে অন্য কোনো প্রাণীর তিনজোড়া পা নেই। তাই পোকাকে ষড়পদী বলা হয়ে থাকে। হাঁটার সময় পোকার সামনের পা দেহকে টেনে নিয়ে যায় এবং পিছনের পা সামনের দিকে ঠেলে দেয়। মাঝখানের পা দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে। সব প্রাণী সাধারণত হাটা বা দাঁড়াবার কাজে পা ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু পোকার বেলায় এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। কাজের পার্থক্যের কারণে পোকাভেদে পায়ের গঠন প্রকৃতিতে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। এ রকম কিছু ব্যতিক্রমধর্মী পা নিচে আলোচনা করা হল।

১. শিকার ধরার উপযোগী পা (Grasping or Raptorial or Preying type leg)

কিছু কিছু পোকা আছে যারা তাদের পা কে শিকার ধরার কাজে ব্যবহার করে থাকে। এ রকম পায়ের কক্সা আকারে বড় এবং ফিমার ও টিবিয়া কাঁটাযুক্ত থাকে। যেমন– প্রেয়িং ম্যানটিড পোকার সামনের পা।

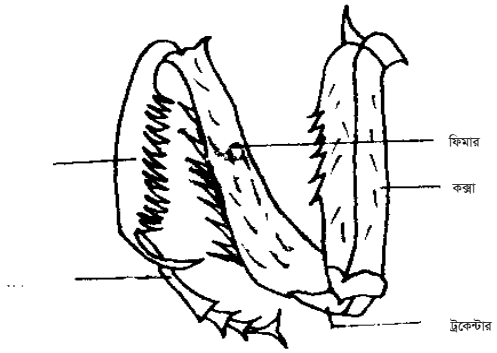

চিত্র ১.১৩ শিকার ধরার উপযোগী পা

২. লাফ দেয়ার উপযোগী পা (Jumping type leg)

অনেক পতঙ্গের পিছনের পায়ের ফিমার আকারে বেশ বড়, পেশীবহুল ও শক্তিশালী। ফলে তারা সহজে লাফ দিতে পারে। যেমন– ঘাস ফড়িং এর পিছনের পা।

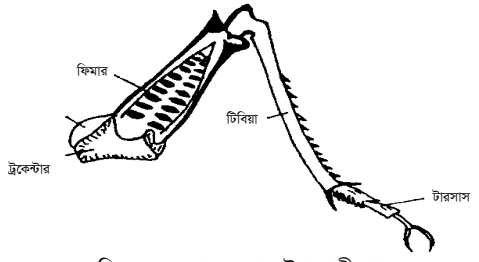

চিত্র ১.১৪ লাফ দেয়ার উপযোগী পা

৩. গর্ত করার উপযোগী পা (Digging type leg)

এ ধরনের পায়ের সবগুলো অংশই পুরু এবং শক্তিশালী। টারসাস তিন খন্ডাংশযুক্ত ও এর অগ্রভাগ দাঁত সদৃশ অর্থাৎ আঁচড়ার মত যা গর্ত করার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন– মোল ক্রিকেটের সামনের পা।

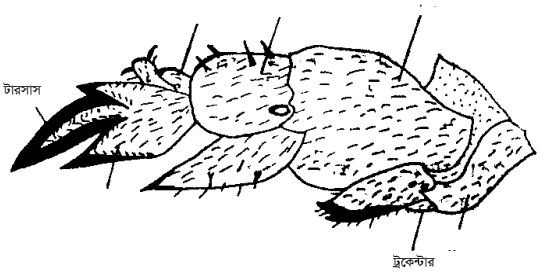

চিত্র ১.১৫ গর্ত করার উপযোগী পা

৪. সাঁতার কাটার উপযোগী পা (Swimming type leg)

এ ধরনের পায়ের কক্সা বেশ প্রশস্ত হয়ে থাকে। টিবিয়া কাঁটাযুক্ত হয় এবং টারসাসের সঙ্গে লম্বা লম্বা লোম থাকে যা পানিতে নৌকার বৈঠার মত কাজ করে। ফলে পোকা এর সাহায্যে সহজে সাঁতরাতে পারে। যেমন– স্কেভেঞ্জার বিটলের (Scavenger beetle) পা।

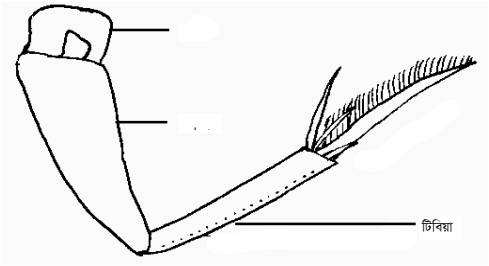

চিত্র ১.১৬ সাঁতার কাটার উপযোগী পা

৫. দৌড়ানোর উপযোগী পা (Running type leg)

অনেক কীটপতঙ্গ আছে যাদের পায়ের ফিমার ও টিবিয়া বেশ লম্বা। ফলে এরা দ্রুত দৌড়াতে পারে। যেমন– তেলাপোকার (Cockroach) পা।

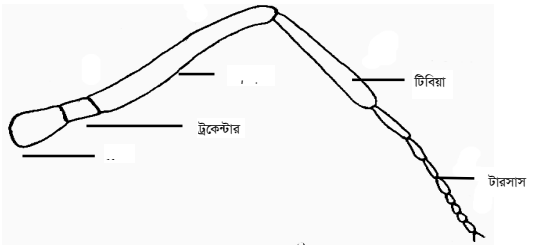

চিত্র ১.১৭ দৌড়ানোর উপযোগী পা

৬. ফুলের রেণু বহনকারী হাটার উপযোগী পা (Walking type beg modified for pollen carrying)

এ ধরনের পায়ের টিবিয়াতে ছোট ছোট লোম (bristle) থাকে। টারসাস পাঁচ খন্ডাংশযুক্ত হয়। টারসাসের প্রথম খন্ড বেশ প্রশস্ত হয় এবং ঝুড়ির (basket) মত দেখায় যা রেণু বহন করে ফুলের পরাগায়নে সাহায্য করে থাকে। যেমন– মৌমাছির পিছনের পা।

চিত্র ১.১৮ ফুলের রেণু বহনকারী হাটার উপযোগী পা

পোকার শুঙ্গ (Antennae of insects)

পোকাতে নানা আকার আকৃতির শুঙ্গ দেখা যায়। যেমন– সিটাসিয়াস, ফিলিফর্ম, মনিলিফর্ম, সিরেট, পেকটিনেট, ক্লাব্‌ড, জেনিকিউলেট, প্লুমোজ, এ্যারিস্টেট ও স্কাইলেট শুঙ্গ।

শুঙ্গ পোকার মাথার অগ্রভাগ অর্থাৎ দুই চোখের মধ্যবর্তী অংশ থেকে উৎপন্ন হয়। পোকায় দুটো শুঙ্গ থাকে। শুঙ্গ হল পোকার একটি অনুভূতি নির্ণয়ক অঙ্গ। এর সাহায্যে পোকা চলাফেরার সময় বিপদজনক অবস্থা সনাক্ত করতে পারে। খাদ্য ও সঙ্গী খুঁজে বের করতে পারে, নিজস্ব গোষ্ঠীর পোকার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে, লিঙ্গ সনাক্ত করা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষ পোকা মিলনের সময় স্পী পোকাকে ধরার কাজে ব্যবহার করে থাকে এবং মৌমাছি স্বাদ ও ঘ্রাণ বুঝতে পারে ইত্যাদি।

পোকায় নানা আকার আকৃতির শুঙ্গ দেখা যায়। নিচে বিভিন্ন প্রকার শুঙ্গের নামসহ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল ঃ

১. সিটাসিয়াস শুঙ্গ (Setaceous antenna)

এ শুঙ্গগুলো দেখতে খুব ছোট এবং দাঁড়ানো চুলের মতো। এদের খন্ডাংশগুলো সামনের দিকে আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসে। যেমন– পাতার হপার, ড্রাগন ফ্লাই ইত্যাদি পোকার শুঙ্গ।

২. ফিলিফর্ম শুঙ্গ (Filiform antenna)

এ রকম শুঙ্গ দেখতে অনেকটা সূতার মতো এবং এদের খন্ডাংশের সবগুলো প্রায় একই সমান। যেমন– টাইগার বিটল, গ্রাউন্ড বিটল প্রভৃতি পোকার শুঙ্গ।

৩. মনিলিফর্ম শুঙ্গ (Moniliform antenna)

এ ধরনের শুঙ্গ অসংখ্য গোলাকার দানাবিশিষ্ট মনে হয় এবং সবগুলো দানা প্রায় একই সমান হয়ে থাকে। যেমন– উঁইপোকার শুঙ্গ।

৪. সিরেট শুঙ্গ (Serrate antenna)

এ রকম শুঙ্গ দেখতে অনেকটা করাতের দাঁতের মত এবং প্রত্যেকটা খন্ডাংশ মোটামুটি ত্রিভুজাকৃতির। যেমন– পূর্ণ বয়স্ক তার পোকার (Click beetle) শুঙ্গ।

৫. পেকটিনেট শুঙ্গ (Pectinate antenna)

এ ধরনের শুঙ্গ দেখতে এক পাশে চিরুনীর মত। যেমন– পাটের বিছাপোকার স্পী মথের শুঙ্গ। আবার শুঙ্গের উভয় পার্শ্ব দেখতে চিরুনীর মত হলে তাকে বাইপেকটিনেট (Bipectinate) শুঙ্গ বলে। যেমন– পাটের বিছাপোকার পুরুষ মথের শুঙ্গ।

৬. ক্লাব্‌ড শুঙ্গ (Clubbed antenna)

এ ধরনের শুঙ্গের খন্ডাংশগুলোর ব্যাস শেষ প্রান্তের দিকে বড় হয়ে থাকে। এ রকম শুঙ্গ আবার চার ধরনের, যেমন –

ক. ক্ল্যাভেট শুঙ্গ (Clavate antenna)
এ ক্ষেত্রে শুঙ্গের খন্ডাংশগুলোর ব্যাস ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। যেমন– লেডি বার্ড বিটলের শুঙ্গ।

খ. ক্যাপিটেট শুঙ্গ (Capitate antenna)
এ রকম শুঙ্গের শেষভাগের কয়েকটি খন্ডাংশের ব্যাস হঠাৎ বেড়ে যায়। যেমন– নিটিডিউলিডি (Nitidulidae) পরিবারের চেলে পোকার শুঙ্গ।

গ. ফ্ল্যাবেলেট শুঙ্গ (Flabellate antenna)
শুঙ্গের শেষ প্রান্তের কয়েকটি খন্ডাংশ জিহ্বার মত দেখায় এবং পরস্পর সমান্তরাল অবস্থায় থাকে। যেমন– স্যান্ডালিডি (Sandalidae) পরিবারের চেলে পোকার শুঙ্গ।

ঘ. ল্যামেলেট শুঙ্গ (Lamellate)
শুঙ্গের শেষ প্রান্তের খন্ডাংশগুলো পার্শ্ব থেকে পাতের মত বেড়ে যায়। যেমন– জুন বিটলের শুঙ্গ।

৭. জেনিকিউলেট শুঙ্গ (Geniculate antenna)
এ ধরনের শুঙ্গের প্রথম খন্ডাংশটি লম্বা থাকে। কিন্তু পরবর্তী খন্ডাংশগুলো খাটো থাকে এবং প্রথম খন্ডাংশের সাথে স্থূলকোণ সৃষ্টি করে অবস্থান করে। যেমন– মৌমাছি ও পিঁপড়ার শুঙ্গ।

৮. প্লুমোজ শুঙ্গ (Plumose antenna)
এ রকম শুঙ্গ অনেকটা পালকের মত দেখায়। শুঙ্গের প্রায় সবগুলো খন্ডাংশ হতেই লম্বা ও ঘন চুলের গোছা বের হলে তাকে প্লুমোজ শুঙ্গ বলে। যেমন– পুরুষ মশার শুঙ্গ। আবার চুলের গোছা ঘন না হয়ে পাতলা হলে তাকে পাইলোজ (Pilose) শুঙ্গ বলে। যেমন– স্পী মশার শুঙ্গ।

৯. এ্যারিস্টেট শুঙ্গ (Aristate antenna)
এ ধরনের শুঙ্গের শেষ খন্ডাংশ বেশ বড় হয় এবং সেই বড় খন্ডাংশের পিঠের দিকে একটা শুঁয়া (Arista) থাকে। যেমন– ঘরের মাছির (House fly) শুঙ্গ।

১০. স্টাইলেট শুঙ্গ (Stylate antenna)
এ রকম শুঙ্গের শেষ প্রান্তে আঙ্গুলের মত একটা অতিরিক্ত অংশ বা স্টাইল (style) থাকে। যেমন– ডাকু মাছির (Horse fly) শুঙ্গ।

চিত্র ১.১৯ বিভিন্ন প্রকার শুঙ্গ

অনুশীলন (Activity) *ঃ পোকার বিভিন্ন প্রকার পায়ের কাজ বর্ণনা করুন।*

সারমর্ম ঃ পাখাহীন ও পাখাধারী উভয় ধরনের পতঙ্গই দেখা যায়। পাখা সাধারণত হলটেয়ার, ইলাইট্রা, হেমিলাইট্রা, ট্যাগমিনা প্রভৃতি ধরনের হয়ে থাকে। তিন জোড়া পা থাকে বলে পোকাকে ষড়পদী বলা হয়। পোকার বিভিন্ন ধরনের পা থাকে। যেমন– শিকার ধরার উপযোগী, লাফ দেয়ার উপযোগী, গর্ত করার উপযোগী, সাঁতার কাটার উপযোগী, দৌড়ানোর উপযোগীও ফুলের রেণু বহনকারী হাটার উপযোগী পা। শুঙ্গ হলো পোকার একটি অনুভূতি নির্ণয়ক অঙ্গ। এর সাহায্যে পোকা বিপদজনক অবস্থা শনাক্ত ছাড়াও বিভিন্ন রকম কাজ করে থাকে। পোকার বিভিন্ন আকার আকৃতির শুঙ্গ থাকে, যেমন– সিটাসিয়াস, ফিলিফর্ম, মনিলিফর্ম, সিরেট, পেকটিনেট, ক্লাবড, জেনিকিউলেট, প্লুমোজ, এ্যারিস্টেট ও স্টাইলেট শুঙ্গ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৫

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

ক. শিকার ধরার উপযোগী পা কোন্ পোকায় থাকে?

i) তেলাপোকা ii) মৌমাছি
iii) ঘাস ফড়ি iv) প্রেয়িং ম্যানটিড

খ. পাটের বিছা পোকার পুরুষ মথের শুঙ্গ কী ধরনের?

i) পেকটিনেট ii) বাইপেকটিনেট
iii) প্লুমোজ iv) পাইলোজ

২। সত্য হলে ''স'' এবং মিথ্যা হলে ''মি'' লিখুন।

ক. পোকার অগ্রবক্ষ থেকে এক জোড়া পাখা গজায়।
খ. মোলক্রিকেটের সামনের পা গর্ত করার উপযোগী।

৩। শুন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. হলটেয়ার ধরনের পাখা উড়ার সময় পোকার দেহের -------- রক্ষা করে থাকে।
খ. হেমিলাইট্রা পাখার শক্ত অর্ধেক অংশের উপরের অর্ধেককে ----- বলা হয়।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. পোকার কয় জোড়া পা থাকে?
খ. মৌমাছির শুঙ্গ কী ধরনের?

ব্যবহারিক

পাঠ ১.৬ ঘাস ফড়িং অঙ্কন ও দেহের বিভিন্ন অংশের নাম লিখুন

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ঘাস ফড়িং এর চিত্র অঙ্কন করতে পারবেন।
- ঘাস ফড়িং এর দেহের বিভিন্ন উপাঙ্গ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- ঘাস ফড়িং এর বিভিন্ন উপাঙ্গের নাম লিখতে পারবেন।
- অর্থোপটেরা বর্গের অন্যন্য প্রজাতির পোকার উপাঙ্গ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- অর্থোপটেরা বর্গের কিছু বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

ঘাস ফড়িং অর্থোপটেরা বর্গের অন্তর্ভুক্ত মাঝারি আকৃতির পোকা। এদের দেহের রং সবুজ থেকে ধূসর এবং এরা উদ্ভিদভোজী। শুঙ্গ সূতাকৃতি, লম্বা বা খাটো। পুঞ্জাক্ষি বড় ও স্পষ্ট, ক্ষুদ্রাক্ষি ৩, ২ বা অনুপস্থিত। মুখোপাঙ্গ চর্বনোপযোগী। এদের অক্ষবক্ষ বড় ও ঢাল বিশিষ্ট। পিছনের পা দুটো বৃহদাকার, পেশীবহুল ও স্ফীতকার হওয়ায় সহজে লাফ দিতে পারে। সামনের পাখা জোড়া পুরু এবং দেখতে চামড়ার মতো যাকে ট্যাগমিনা বলা হয়। খাটো শুঙ্গ বিশিষ্ট ও লম্বা শুঙ্গ বিশিষ্ট দু'ধরনের ঘাস ফড়িং আছে। খাটো শুঙ্গ বিশিষ্ট ঘাস ফড়িং এর ডিম পাড়া অঙ্গ খাটো, শুঙ্গ দেহের চেয়ে খাটো এবং টারসি সাধারণত তিন খন্ডাংশযুক্ত। কিন্তু লম্বা শুঙ্গ বিশিষ্ট ঘাস ফড়িং এর ডিম পাড়া অঙ্গ লম্বা যা দেখতে তরবারির মতো, শুঙ্গ দেহের চেয়ে লম্বা এবং টারসি সাধারণত ৪ খন্ডাংশযুক্ত। অর্থোপটেরা বর্গের পোকাগুলোর শব্দ সৃষ্টি করার মতো অঙ্গ আছে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. ড্রইং পেপার
২. পেন্সিল
৩. পেন্সিল কাটার
৪. রাবার
৫. স্কেল

কাজের ধাপ

১. ড্রইং পেপার ও পেন্সিল নিন।
২. ঘাস ফড়িং এর চিত্র দুটো ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করুন।
৩. এবার চিত্র দুটো অনুসরণ করে প্রাসঙ্গিক তথ্যের সাথে মিল রেখে ড্রইং পেপারে এদের চিত্র অঙ্কন করুন।
৪. অতঃপর অঙ্কিত চিত্রে ঘাস ফড়িং এর উপাঙ্গগুলো চিহ্নিত করুন।
৫. প্রয়োজনে রাবার, পেন্সিল কাটার ও স্কেল ব্যবহার করুন।

সতর্কতা

চিত্র দুটো যাতে পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন।

চিত্র ১.২০ খাটো শুঙ্গ বিশিষ্ট ঘাস ফড়িং

চিত্র ১.২১ লম্বা শুঙ্গ বিশিষ্ট ঘাস ফড়িং

পাঠ ১.৭ পোকার বিভিন্ন মুখাবয়ব পর্যবেক্ষণ ও অঙ্কন

এ পাঠ শেষে আপনি–

- কীটপতঙ্গের বিভিন্ন প্রকার মুখোপাঙ্গের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- কীটপতঙ্গের বিভিন্ন ধরনের মুখোপাঙ্গের নাম বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার মুখোপাঙ্গে কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

কীটপতঙ্গের মুখে উপস্থিত উপাঙ্গ সমূহকে মুখোপাঙ্গ বলা হয়। যেমন– উপরের ওষ্ঠ, নিচের ওষ্ঠ, ম্যান্ডিবল, ম্যাক্সিলা, জিহ্বা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আলজিহ্বা থাকে। মুখের এ সমস্ত উপাঙ্গগুলো পোকার খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা দিয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের জন্য এদের মুখোপাঙ্গের ধরনও বিভিন্ন হয়ে থাকে। নিচে বিভিন্ন রকমের মুখোপাঙ্গের নাম উল্লেখ করা হলো–

১. চর্বনকারী মুখোপাঙ্গ (Chewing type mouthparts) যেমন– ঘাস ফড়িং ।
২. কর্তন ও শোষণকারী মুখোপাঙ্গ (Cutting and sponging type mouthparts) যেমন– ডাকু মাছি (Horse fly)
৩. শোষণকারী মুখোপাঙ্গ (Sponging type mouthparts) যেমন– ঘরের মাছি।
৪. চর্বন ও লেহণকারী মুখোপাঙ্গ (Chewing and lapping type mouthparts) যেমন– মৌমাছি।
৫. অনুবিদ্ধন ও চোষণকারী মুখোপাঙ্গ (Piercing and sucking type mouthparts) যেমন– মশা
৬. নলাকার মুখোপাঙ্গ (Siphoning type mouthparts) যেমন– প্রজাপতি।

উপরোক্ত বিভিন্ন ধরনের মুখোপাঙ্গের বিশদ বর্ণনা ও এদের চিত্র পাঠ ১.৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. নিডল (Needle)
২. কাঁচি (Scissors)
৩. ব্রাশ 0-0 (Brush 0-0)
৪. আতশী কাঁচ (Magnifying glass)
৫. পাইড (Slide)
৬. অনুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope)
৭. পেন্সিল
৮. পেন্সিল কাটার
৯. রাবার
১০. ড্রইং পেপার ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

১. ঘাস ফড়িং, ডাকু মাছি, ঘরের মাছি, মৌমাছি, মশা ও প্রজাপতি সংগ্রহ করুন।
২. আপনার টিউটরের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় উপকরণ দ্বারা উল্লেখিত পোকাগুলোর মুখোপাঙ্গ সনাক্ত করুন।
৩. অতঃপর তা পাইডের উপর স্থাপন করে আতশী কাঁচ বা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পর্যবেক্ষণ করুন।
৪. এরপর পর্যবেক্ষনানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের মুখোপাঙ্গগুলো ড্রইং পেপারে অঙ্কন ও চিহ্নিত করুন।
৫. প্রয়োজনে পেন্সিল কাটার, রাবার ও স্কেল ব্যবহার করুন।

সতর্কতা

১. সঠিক পন্থায় মুখোপাঙ্গগুলো সনাক্ত করুন।
২. মুখোপাঙ্গের চিত্রগুলো যাতে পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন– ইউনিট ১

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। সংজ্ঞা দিন।

ক. শস্য সংরক্ষণ খ. আপদ

২। বিভিন্ন প্রকার আপদ দ্বারা শস্যের কী পরিমাণ ক্ষতি হয় তা আলোচনা করুন।

৩। কীটপতঙ্গের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিন।

৪। পাঁচটি উপকারী পোকার নাম লিখুন। কীটপতঙ্গের উপকারী প্রভাব আলোচনা করুন।

৫। একটি পোকার বাহ্যিক গঠন অঙ্কন করে তা চিহ্নিত করুন।

৬। পোকার বিভিন্ন প্রকার মাথার বর্ণনা দিন।

৭। পোকার মুখে কী কী উপাঙ্গ থাকে। ম্যাক্সিলা ও ম্যান্ডিবলের গঠন চিহ্নিত চিত্রসহ দেখান।

৮। পোকার শুঙ্গের চিহ্নিত চিত্র দিন।

৯। পোকার একটা স্বাভাবিক পায়ের চিহ্নিত চিত্র দিন।

১০। পোকার পাখার সাধারন শিরাবিন্যাস চিত্র সহকারে দেখান।

১১। চিত্র সহকারে ব্যাখ্যা করুন।

ক. চর্বনকারী মুখোপাঙ্গ খ. কর্তন ও শোষনকারী মুখোপাঙ্গ

গ. শোষণকারী মুখোপাঙ্গ ঘ. চর্বন ও লেহনকারী মুখোপাঙ্গ

ঙ. অনুবিদ্ধন ও চোষণকারী মুখোপাঙ্গ চ. সাইফনিং মুখোপাঙ্গ

১২। হলটেয়ার, ইলাইট্রা, হেমিলাইট্রা ও ট্যাগমিনা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১৩। পোকার বিভিন্ন প্রকার পা চিত্র সহকারে ব্যাখ্যা করুন।

১৪। শুঙ্গের কার্যাবলী লিখুন।

১৫। বিভিন্ন প্রকার শুঙ্গ চিত্র সহকারে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা– ইউনিট ১

পাঠ ১.১

১। ক. iii খ. ii
২। ক. মি খ. স
৩। ক. প্লেগ খ. ৮০ থেকে ১০০
৪। ক. ইঁদুর, শিয়াল খ. ১০ থেকে ১৫ ভাগ

পাঠ ১.২

১। ক. iv খ. iii
২। ক. স খ. মি
৩। ক. শিকড় খ. লাক্ষা
৪। ক. জাবপোকা খ. লেডি বার্ড বিটল

পাঠ ১.৩

১। ক. iii খ. iii
২। ক. স খ. মি
৩। ক. টারগাইট খ. টারসাস
৪। ক. তিন ভাগে খ. পায়ের

পাঠ ১.৪

১। ক. ii খ. i
২। ক. মি খ. স
৩। ক. অনুবিদ্ধন ও চোষণোপযোগী খ. ম্যান্ডিবল, স্পষ্ট ম্যাক্সিলা
৪। ক. মুখের খ. শোষণোপযোগী

পাঠ ১.৫

১। ক. iv খ. ii
২। ক. মি খ. স
৩। ক. ভারসাম্য খ. কোরিয়াম
৪। ক. তিন জোড়া খ. জেনিকিউলেট